হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু : দেবব্রত বিশ্বাস

জন্ম - ১৯১১ / মৃত্যু - ১৮ই আগষ্ট ১৯৮০

রবীন্দ্রসংগীতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গায়কদের একজন হলেন দেবব্রত বিশ্বাস। তাঁর গভীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে প্রবেশ করলে উদাসীন হৃদয়ে সাড়া ওঠে, বুকের মধ্যে বেজে ওঠে গুরু গুরু ধ্বনি। তবু এটিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বেরও একটা আলাদা বর্ণচ্ছটা নিশ্চয়ই ছিল, যার জন্য তিনি বিতর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন বার বার। তাঁর চারপাশে যে সব লোক তাঁকে অপছন্দ করেছিলেন তাঁরাও কিন্তু অস্বীকার করতে পারনেনি তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে। আর এখন তাঁর শতবার্ষিকীর দোরগোড়ায় এসেও তাঁর নতুন নতুন শোভন আকারের সি ডি সংকলন ক্রমাগত বেরিয়েই যাচ্ছে; তাঁকে নিয়ে 'রুদ্ধসংগীত' নামে নাটক করেছেন ব্রাত্য বসু। সেই নাটকে তাঁর জীবনকাহিনির দর্পনে প্রতিফলিত হচ্ছে একালের রাজনীতি ও সমাজনীতি। একশো বছরের কালসীমায় এসেও যে লোক এতক্ষানি জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক তিনি নিশ্চয়ই খুব ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে অধুনা বংলাদেশের ময়মনসিংহে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর ঠাকুরদা কালিকিশোর বিশ্বাস ছিলেন প্রথম যুগের ব্রাহ্ম, অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ ও জেদি লোক। ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাপ দিলে তিনি ওভাবে আপোস করা অসম্মানজনক বিবেচনায় স্বগ্রাম ও পৈতৃক ভিটে ছেড়ে চলে যান কিশোরগঞ্জ শহরে। সেখানকার পরিবেশ অপেক্ষাকৃত উদার ও মুক্ত ছিল বলে এখানেই তিনি সংসার পাতেন। দেবব্রতের শৈশব কেটেছে কিশোরগঞ্জে। তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসও ছিলেন নীতিনিষ্ঠ ব্রাহ্ম। সেকালের ব্রাহ্মপরিবারগুলির রীতি অনুযায়ী তিনি প্রতি সন্ধ্যায় নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে উপাসনায় বসতেন। উপাসনা শেষে গান হত। দেবব্রতের মা ভালো গান জানতেন বলে বাড়িতে গানের চর্চা ছিল এবং নানারকম গানই হত। অবশ্য সবই ব্রহ্মসংগীত। এই সব গানের একটা বড় অংশ ছিল রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গান। বালক দেবব্রত অবশ্য খোঁজ রাখতেন না কোন গান কার লেখা বা আদৌ রবীন্দ্রনাথ বলে কেউ আছেন কি না। কিন্তু চেতনার উন্মেষকালেই অজান্তে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তাঁর অন্তরাত্মা বাঁধা পড়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অজান্তে গানের প্রতি তাঁর মনে আকর্ষণ জন্মাল। সেকালের সেই প্রাচীন বঙ্গদেশে জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ, গ্রাম চলত ঐতিহ্যাগত সংস্কৃতি আশ্রয়ে। লোকের মনে ত্বরা ছিল না বলে গলায় গানও ছিল। মাঝি নৌকো চালাতে চালাতে গান গাইত। বাউল বৈষ্ণব গান গেয়ে ভিক্ষা করত। দেবব্রত এসব মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। একটু বড় হয়ে গান শোনার অন্যরকম সুযোগ হল। জনৈক পরিচিতের দোকানে ছিল কলের গান। সেকালের সেই চোঙওয়ালা গ্রামোফোন যন্ত্রে বাজত তখনকার সব আধুনিক গান কেএল মল্লিক, আশ্চর্যময়ী দাসী, বেদানা দাসী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা ইত্যাদির গান। দেবব্রত তাও শুনতেন। এইভাবে ছোট থেকেই নানারকম গান শুনতে শুনতে তৈরি হয়ে উঠেছিল তাঁর সংগীতরুচি ও বিচারবুদ্ধি।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জের স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পাশ করলেন। প্রথমে স্থানীয় কলেজে ভর্তি হলেও অল্পদিনের মধ্যে চলে আসেন কলকাতায় । সিটি কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজে কাটে তাঁর কলেজ জীবন। শেষোক্ত কলেজে বি.এ. পড়বার সময় তিনি ঘটনাচক্রে সংগীতচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে গেলেন। এখানেই তাঁর আলাপ হল শৈলেশ দত্তগুপ্ত, হিমাংশু দত্ত, ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মেসবাড়ির বন্ধু হিসাবে পেলেন সন্তোষ সেনগুপ্তকে। নানা রকম গান ও গায়কীর সংস্পর্শে আসার ফলে গান সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও রকম গোঁড়ামি তৈরি হবার আর অবকাশ রইল না।

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ করে তিনি হিন্দুস্থান ন্যাশনাল ইনসিওরেন্সে কর্মজীবন সুরু করলেন। এইসময় একটি ছোট ঘটনায় তাঁর সংগীতসাধনার একটি বন্ধ দরজা খুলে গেল। ঘটনাটা হল ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে পরিচয়। জনৈক বন্ধুর সঙ্গে কর্মসূত্রে তিনি এঁর বাড়িতে যান। গিয়ে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের নানা বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন। এতদিন তাঁর শুধু অধ্যাত্মসংগীতগুলিই জানা ছিল। এখন দেখলেন প্রেম, ঋতু, এবং অন্য আর বহু বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীতের অফুরন্ত ভাণ্ডার। সেকালের সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে রবীন্দ্রসংগীতের আদর ছিল না। আর ব্রাহ্মরা গাইতেন পূজা পুর্যায়ের গানগুলি। এখন ইন্দিরা দেবীর কাছে দেবব্রত সব রকম গানের চর্চা হতে দেখলেন। এখানে তিনি দেখলেন বিলিতি যন্ত্র বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হচ্ছে, এবং তাতে তার রসহানি হচ্ছে না। এখানে তিনি আরও শিখলেন স্বরলিপি করতে এবং স্বরলিপি দেখে গান তুলতে। এইভাবে তাঁর রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষায় যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল তা কেটে গেল। এবার আত্মপ্রকাশের পালা।

৪০ এর দশক দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনের একটা কর্মময় পর্ব। বন্ধুবর সন্তোষ সেনগুপ্ত তাঁর সঙ্গে নজরুল ইসলাম ও সংগীত পরিচালক চিত্ত রায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা সেনোলা কোম্পানি থেকে তাঁকে দিয়ে নজরুলগীতির দুটি রেকর্ড করিয়েছিলেন। যে কোনো কারনেই হোক তা প্রকাশিত হল না। তখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির। এঁরা শৈল্যজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় কনক দাসের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে তাঁর দুটি রেকর্ড করলেন — সঙ্কোচের বিহ্বলতা, এবং হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। পরে আরও রেকর্ড হল। এককভাবে এবং দ্বৈতভাবে। তিনি আকাশবানীতেও নিয়মিত গাইতে লাগলেন।

তাঁর ব্যক্তিজীবনে তখন নানা কর্মের জোয়ার এসেছে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, এবং গণনাট্য সংঘের শিল্পি হিসাবে নানা স্থানে অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন। গননাট্যের বাঁধধরা গানের সঙ্গে তিনি গাইতেন রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক

সৃষ্টিসন্ধান

গানগুলি। এ সময় তাঁর জীবন ছিল কর্মব্যস্ত ও ভ্রাম্যমান। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে। পরে পেলেন সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রকে। ইতিমধ্যে রেকর্ডে তাঁর আঠারোটি রবীন্দ্রসংগীত বেরিয়ে গেছে।

দেবব্রত বিশ্বাসের তরুণ বয়সে উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া সেই সব গান আজকের দিনের শ্রোতার কাছে পরম সম্পদ হতে পারত। কিন্তু সেকালে; সেই চল্লিশের দশকে আম জনতা সেগুলিকে অভ্যর্থনা জানায় নি। তখন গ্রামোফোন কোম্পানির কর্তারা তাঁর রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড আর করতে চাইলেন না। পরিবর্তে তাঁরা প্রস্তাব দিলেন আধুনিক বাংলা গান গাইবার। দেবব্রত এ প্রস্তাব অস্বীকার করলেন। গানের ব্যবসায়িক জগৎ থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেকে। প্রথমবার রুদ্ধ হল তাঁর সংগীত।

এর পর প্রায় পুরো দশ বছর গানের জগৎ থেকে তিনি সরে রইলেন। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যোগ রইল বটে, কিন্তু পার্টির সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কের মাধুর্য ক্রমেই কমতে লাগল। অবশেষে তিনি একদিন পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দিলেন।

নিজের স্পষ্টবক্তা একরোখা স্বভাবের জন্য অনেকের সঙ্গে যেমন তাঁর বিচ্ছেদ হল অনেকে তেমনিই চলে এলেন খুব কাছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ছিল সরল। অকৃতদার মানুষটির সাংসারিক প্রয়োজন ছিল কম। বন্ধুবান্ধব অনেকের জন্যই এই সময় তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজের জীবনটা তিনি নিজের মত করেই কাটাতেন ছোট ছোট শখ শৌখিনতা নিয়ে এবং মাথা উঁচু করে, সন্তুষ্টচিত্তে।

বেশ কয়েক বছর এইভাবে কাটল। তাঁর সংগীত জীবনের চাবিকাঠিটি সাময়িকভাবে বন্ধ করা ছিল বলে যে তিনি গান ছেড়ে দিয়েছিলেন এমন নয়, বরং কিছুদিন ফেলে রাখার পর আবাদি জমি যেমন দ্বিগুন ফসল দেয় তেমনি এক ঘটনা ঘটল এরপর দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনে।

তখন পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি। তাঁর চেয়ে বয়সে ছোটো নতুন কালের গায়ক গায়িকারা অনেকেই এসে গেছেন। বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে জনরুচিতে, রবীন্দ্রসংগীত এখন আর হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরে ব্রাত্য নয়, বরং তা হয়েছে এলিট সমাজের শিরোভূষণ। পঙ্কজ মল্লিকের মত গায়কেরা সফলভাবে এ গান চলচ্চিত্রে প্রয়োগ করে এর বাণিজ্যসম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির চণ্ডীচরণ সাহা সুপ্ত প্রতিভা দেবব্রত বিশ্বাসকে খুঁজে বার করলেন। তিনিই উদ্যোগী হয়ে এইচ. এম. ভির সঙ্গে তাঁর পুরনো চুক্তি থেকে তাঁকে মুক্ত করে এনে নতুন নতুন রেকর্ড করাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এসে গেল রবীন্দ্র শতবর্ষ। সেই অনুকূল হাওয়ায় দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীত দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল।

ষাটের দশক তাঁর সাংগীতিক সাফল্যের তুঙ্গ সময়। তিনি ফিল্মে প্লে ব্যাক করেছেন (মেঘে ঢাকা তারা), রবীন্দ্রসংগীতের ইংরেজি ভার্সন বার করেছেন, যন্ত্রানুসঙ্গে নানা পরীক্ষা করেছেন। লোকে তা সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিরোধ বাধল অন্য জায়গায়; বিরোধ হল বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সঙ্গে। প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর তথাকথিত স্বেচ্ছাচার।

দেবব্রতের গান ঠিক প্রথাগত রবীন্দ্রসংগীত ছিল না। কোথাও কোথাও তিনি স্বরলিপি লঙ্ঘন করেছেন (যৎসামান্য), অনুষঙ্গে এবং ইনটারল্যুডে বাজিয়েছেন বহুবিধ যন্ত্র; বিদেশি স্প্যানিশ গিটার, স্যাক্সোফোন, ক্লারিওনেট, পিয়ানো, চেল্লো; আবার স্বদেশি সেতার, সরোদ, বেহালা, এস্রাজ। হারমোনিয়ামেও তাঁর আপত্তি নেই, এদিকে বিশ্বভারতীর নিয়মে তখন রবীন্দ্রসংগীতে এত যন্ত্রব্যবহারের প্রথা ছিল না। আর এর বানিজ্যিক কর্তা ছিলেন আইনত : তাঁরাই। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই এ নিয়ে দেবব্রতের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ বাঁধল। বিশ্বভারতী তাঁর গানের বাহ্যিক ত্রুটিটাই (তাঁদের বিবেচনায়) বড় করে দেখলেন। আর গায়ক ভাবলেন ওরা বাইরেটাই দেখল। অথচ রবীন্দ্রনাথের গানে কিভাবে তিনি প্রাণসঞ্চার করেন সেই আসল সত্যটুকু অস্বীকার করল, এটা অন্যায়। ক্রমে দু পক্ষেই অনেক ঈর্ষাকাতর ও কলহপ্রিয় লোকজন জুটে যাওয়ায় বিরোধ ও তিক্ততা ক্রমশ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে দেবব্রত আত্মভিমানে রবীন্দ্রসংগীতের বাণিজ্যিক জগৎ থেকে সরে এলেন। তাঁর রেকর্ড করা বন্ধ হল। দ্বিতীয়বার তাঁর গান থেকে বঞ্চিত হল দেশের লোক।

অথবা সত্যি কি বঞ্চিত হোল? বরং এই ঘটনায় একটা প্রবল সহানুভূতির হাওয়া উঠল তাঁর পক্ষে— অবানিজ্যিক আসরে বা ঘরোয়া আসরে দেবব্রত যখন যা গেয়েছেন বন্ধুজনেরা তৎক্ষণাৎ তা টেপবন্দী করে রেখেছেন। পুরনো রেকর্ড এবং এখনকার এইসব টেপ এ তাঁর প্রায় সব গানই মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। এখনও নিত্য নতুন শোভন আকারে তাঁর নানারকম সিডি বেরিয়ে চলেছে।

তবে সে তো তাঁর শিল্পিসত্তার জয়, চিরকালের অমরতার কথা। শক্তি থাকতেও গান গাইতে না পারায় শিল্পির নিজের যে দুঃখ এতে তার সান্ত্বনা হয় না। সে দুঃখ গায়ককে অভিভূত করেছিল এবং জীবনের এই শেষপর্বে এসে তিনি লিখেছিলেন মর্মস্পর্শী আত্মজীবনী ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত।

এ বই বেরোল ১৯৭৯ এ এবং পরের বছর ১৯৮০ সালের ১৮ই আগষ্ট তাঁর জীবনাবসান হল।

এর পর ১৯৮২ তে উৎপলেন্দু চৌধুরী তাঁকে নিয়ে ডকুমেন্টারি বানালেন। এই ২০০৯এ এসে ব্রাত্য বসু নাটক লিখেছেন রুদ্ধসংগীত নাম দিয়ে। কলকাতার পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে তা অভিনীত হচ্ছে। বিতর্কে, বিরোধে, অভিমানে ভালোবাসায় বর্ণময় যে মানুষ দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন তাঁর স্মৃতি এবং সাধনা এখনও অনেককাল অম্লান থাকবে।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান